Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Review Article

কাজী নজরুল ইসলামের *বাঁধন-হারা* উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী পর্যালোচনা: একটি ভিন্ন রূপরেখা

আতি-উন-নাহার [১*] ও মো: কয়েছ আহমেদ[১]

[১] বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।
*** Corresponding Author:** আতি-উন-নাহার; ই-মেইল: atiunnahar@gmail.com; মোবাইল নং: +৮৮০ ১৭৫৯-২৪৬৩৭১ ।
Received: 23/04/ 2025; **Accepted**: 29/07/2025; **Online Available**: 04/08/2025.

সারসংক্ষেপ

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ও সম্ভ্রমজাগানিয়া এক নাম। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের পদচারণা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কবিতার মতো কথাসাহিত্যেও তিনি জীবনঘনিষ্ঠ, সাহসী, সম্প্রীতি আর মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত। নজরুলের কবিতা ও গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি সংখ্যার দিক দিয়ে প্রায় সমান। *বাঁধন-হারা*, *মৃত্যুক্ষুধা*, *কুহেলিকা* - এই তিনটি উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাসে কবি নজরুল দিয়েছেন ভিন্নতার স্বাদ। *বাঁধন-হারা* (১৯২৭) নজরুলের প্রথম পত্রোপন্যাস। তাঁর উপন্যাসে রয়েছে আবেগ-অনুভূতি, প্রতিবাদ, বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা, প্রান্তজনের কথা, বিভিন্ন ধর্মীয় পুরাণের ব্যবহার, বিপ্লববাদী মানসিকতা। বিষয় ও চিন্তার অভিনবত্বে, চরিত্রের উপস্থাপনায়, ভাষার ব্যবহারে এবং স্বতন্ত্র স্টাইল প্রয়োগে তিনি সকলের চেয়ে অনন্য। অপরদিকে তাঁর রচনার একটি নিজস্ব স্টাইল বা রীতি বিদ্যমান। যেখানে অনায়াসে তিনি কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন ভাষার শব্দ ব্যবহার, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্রানুযায়ী ভাষা প্রয়োগ তাঁর সাহিত্যকে করেছে স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ। এযাবৎ বেশিরভাগ আলোচনা ও সমালোচনা গ্রন্থ- নজরুলের জীবনী, কাব্যসাহিত্য, কথাসাহিত্য, পৌরাণিক প্রসঙ্গ, তাঁর বিপ্লববাদী মানসিকতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে। নজরুলের কথাসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্যের আলোচনা এবং রচনাশৈলীর মাধুর্য ও স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে কম পরিলক্ষিত হয়। আর সে কারণেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পত্রোপন্যাস নজরুলের *বাঁধন-হারা* উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনা এবং সমকালে তাঁর ভাষাগত ভিন্নতা, নিজস্ব রচনা স্টাইল নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। এক্ষেত্রে গবেষণার পরিধি হিসেবে নজরুলের *বাঁধন-হারা* (১৯২৭) উপন্যাসের টেক্সট ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতির প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্বাচিত উপন্যাস বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাময়িকী, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বোপরি আবেগ ও ভাবালুতাপ্রধান আলোচনাকে পরিত্যাগ করে নতুন গবেষকদের অধিকতর যুক্তিবাদী বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধকরণ, বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবস্থানকে নবতর মূল্যায়ন, বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নজরুলচর্চার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষিত মহল ও পাঠকসমাজের উপর নজরুলের উপন্যাসের প্রভাব বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয় আলোচ্য গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায় এটি গবেষণার জগতে একটি নতুন সংযোজন হবে।

মূল শব্দ সূচক: *অভিনবত্ব, বাঁধন-হারা, বিংশ শতাব্দী, উপন্যাস, বিষয়-বৈচিত্র্য, রচনাশৈলী, ভিন্ন রূপভেদ, ভাষাবৈচিত্র্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সমাজবাদ, যুক্তিবাদ, দার্শনিক, বিশ্লেষণ*

ভূমিকা

সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দ প্রদান। যাকে বলা হয় নন্দনতাত্ত্বিক সাহিত্য। বিংশ শতাব্দীতে এসে আধুনিক লেখকবৃন্দ নন্দনতত্ত্বকে অনেকটা পরিহার করে রূঢ় বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছিলেন। মণীষী কার্ল মার্ক্সের চিন্তাধারা, ফ্রয়েডের মনোবিকলনবাদ আধুনিক লেখক সমাজের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। অনেক ক্ষেত্রে নজরুলও তার ব্যতিক্রম। বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক মতবাদ নজরুল ধারণ করেছিলেন তাঁর মানসে। কাজী নজরুল ইসলাম বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি, কথাসাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সুরস্রষ্টা, অভিভাষণ রচয়িতা ও দার্শনিক। কাজী নজরুল তিন হাজারের বেশি গানসহ যে মূল্যবান সাহিত্য বাংলাভাষী মানুষকে উপহার দিয়ে গেছেন তা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। গত শতাব্দীর ঔপনিবেশিক সময়পর্বে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। সমাজবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্ক্সের প্রভাব নজরুলের মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল গভীরভাবে। সংগীত ও কাব্যসাহিত্যের পাশাপাশি নজরুলের রয়েছে বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ কথাসাহিত্য। এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাঁর উপন্যাস-ত্রয়ী। নজরুল তাঁর উপন্যাসসমূহে সমকালীন প্রেক্ষাপট এবং ব্যতিক্রমী দ্রোহ-কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন। লক্ষ করা যায়, জনপ্রিয়তায় কাব্যচর্চার পাশে নজরুলের কথাসাহিত্য অপেক্ষাকৃত অনুচ্চারিত ও উপেক্ষিত। কেননা আমরা সাধারণত নজরুলের কাব্যসাহিত্য এবং সংগীতমাধুর্যে বিমোহিত। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক উপন্যাস রচনা করেও নজরুল

© Journal of Gono Bishwabidyalay All Rights Reserved

আমাদের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসে কবি নজরুল যা দিয়েছেন তা ভিন্নতায় পর্যবসিত। *বাঁধন-হারা*, *মৃত্যুক্ষুধা* ও *কুহেলিকা*-এ তিনটি উপন্যাসেই তিনি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। সম্পূর্ণ ত্রিমুখী ধারার প্রতিনিধিত্ব করে এমন তিনটি উপন্যাস নজরুল রচনা করেছেন [১]। কাব্যের মত উপন্যাসেও নজরুল দ্রোহাত্মক ভাষা প্রয়োগ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের ভাষা অনন্যতায় উদ্ভাসিত। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, যমক, শ্লেষ- প্রভৃতি অলংকারের অনায়াস প্রয়োগ এক অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য প্রদান করেছে নজরুলের গদ্যসাহিত্যকে। ঔপন্যাসিক হিসেবে কম জনপ্রিয় হলেও তাঁর উপন্যাসে যে দেশপ্রেম ও চিন্তাচেতনার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত তার মূল্য অপরিসীম। তবে বর্তমান প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর সমকাল সচেতন কবি নজরুলের ঔপন্যাসিক সত্তাকে অধিক গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে তাঁর *'বাঁধন-হারা'* উপন্যাসের বিষয়-আশয়, রচনাশৈলী ও ভাষাগত আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

প্রেক্ষাপট

ব্রিটিশ শাসনামলে পুরো ভারতবর্ষের সকল শ্রেণির মানুষের মন ও মননে তাঁর চিন্তা চেতনার জন্য কাজী নজরুল ইসলাম গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা-দ্বন্দ্ব-হতাশা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নজরুল-সত্তায় গভীরতর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। সমগ্র বাঙালি দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতিকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর মতো আর কেউ বোধ করি আলোড়িত-উজ্জীবিত করতে পারেননি, নজরুল সমাজের রুপান্তর ঘটাতে চেয়েছেন [২]। খেলাফত-অসহযোগ-সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মূলমন্ত্রে সম্পৃক্ত মানুষের অন্তর জিজ্ঞাসায় ও প্রত্যাশায় ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গন ছিল অস্থির [৩]। সেই সাথে নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পৈশাচিক তৎপরতায় আচ্ছন্ন ছিল গোটা দেশ। বিবদমান সম্প্রদায়ের বিচার-বিবেকহীন আবেগ ও ঈর্ষায় দিগভ্রান্ত হয়েছিল মানুষ। এই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘূর্ণাবর্তই মূলত নজরুলকে একজন কর্মী, কবি ও সংগঠক হিসেবে গড়ে তোলে। তাই এই সময়ে নজরুলের আবির্ভাব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটই নয়, তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বিভিন্ন আন্দোলন। ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব, আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে নবজাগরণ, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯১৯ সনের রাউলাট আইন, ১৯১৯ সনের মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড শাসন সংস্কার রিপোর্ট, ১৯১৯ সনের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ১৯২০ সনের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২২ সনের আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯২৬ সনের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৩০-এর সূর্যসেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ ইত্যাদি অন্যতম ঘটনাবলি তাঁর চেতনার উপর প্রভাব ফেলেছিল। সামাজিক শোষণ ও দারিদ্র্য, ধর্মীয় কুসংস্কার, নারীর অধঃস্তন অবস্থান, শ্রেণি বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়গুলোও তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুগের মানস চাঞ্চল্য এবং বেদনাকে নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা, গান ও উপন্যাসে নানাভাবে রূপায়িত করেছেন। সে যুগে নজরুলের মতো অন্য কোনো কবির রচনায় যুগ ও সমাজের প্রভাব এতটা পড়েনি। মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি লেখা শুরু করেছিলেন, তাই একই সঙ্গে সাহিত্যসেবা এবং সমাজসেবা করতে পেরেছিলেন। 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান-এ কথাটি হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক উচ্চারণ' [৪]। নজরুল পরাধীন দেশে লেখনী ধারণ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসক চক্ষুকে পরোয়া না করে একাই লড়ে যাওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলামের কল্যাণে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার দিকে বৃহত্তর দেশের দৃষ্টি পড়েছে-এ বললে অন্যায় হয় না। নজরুল আপোসহীন সংগ্রাম ঘোষনা করেছিলেন সকল প্রকার সামাজিক বিভেদ, অর্থনীতিক নিপীড়ন ও রাজনৈতিক পরবশতার বিরুদ্ধে [৫]।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপে যে স্বার্থপর ও সংগ্রামশালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটেছিল, তারই চরম পরিণতি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধে এত বেশি দেশ ও জাতি পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল যে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ইতঃপূর্বে আর ঘটেনি। যুদ্ধের আয়োজনে, সৈন্য সংখ্যায় কিংবা জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি যে-কোনো বিচারে পৃথিবীর কোনো যুদ্ধের সঙ্গেই এর তুলনা হয়না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের মাধ্যমে আমেরিকা তার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতির অবসান ঘটিয়েছিল এবং যুদ্ধে যোগদানের পেছনে তৎকালীন আমেরিকা সরকার বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। বিশেষ করে মহাযুদ্ধোত্তর বিভিন্ন আন্দোলন নজরুল ইসলামকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে [৬]। ১৯১৭ সালে কাজী নজরুল ইসলামের বয়স ১৭ বছর ৭ মাস। এই বছরের মধ্যভাগে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক গঠিত সৈন্য বাহিনী বেঙ্গল ডবল কোম্পানিতে যোগদান করেন। পরে এটি রেজিমেন্টে পরিণত হয়। এর নাম দেয়া হয় ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট। সৈন্যবিভাগে যোগদানের পর প্রশিক্ষণের জন্য তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নৌশেরায় প্রেরিত হন। তিন মাস প্রশিক্ষণের পর তাঁর স্থায়ী কর্মস্থল হয় করাচি ক্যান্টনমেন্ট। তিনি কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি করাচী সেনানিবাসে সৈনিকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চা করতেন। এই সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি রচনা করেন উপন্যাস। ধূমকেতুর মতই বাংলার, বাঙালির জীবনে-গানে-প্রাণে আর সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব, নজরুল এসময় রুশ বিপ্লব দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন [৭]। বাংলা সাহিত্যের জগতে নবযুগের মতো আবির্ভূত হয়ে একের পর এক কাব্য, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, নাটক আমাদের উপহার দিয়েছেন। কবিতা, গানের পাশাপাশি কাজী নজরুল ইসলাম উপন্যাস রচনায়ও পাঠক হৃদয় ও মন ছুঁয়েছেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর সফলতার দৃষ্টান্ত- *বাঁধন-হারা* (১৯২৭)। সমকালীন রাজনীতি,

অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মানবিক জাগরণের দিক বড় তাৎপর্যের সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে। নজরুল সমাজ রাষ্ট্র, ব্যক্তিজীবন, মানবিক মূল্যবোধ এবং উন্নয়ন সূচকগুলো অবলম্বন করে উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাঁধন-হারা (১৯২৭) বাংলা সাহিত্যে রচিত প্রথম সার্থক পত্রোপন্যাস। সামাজিক জটিলতা ও অতৃপ্ত প্রেম এই উপন্যাসের পত্রে পত্রে বিস্তৃত। বাংলা সাহিত্যে এই রীতিতে রচিত সাহিত্যসংখ্যা নিতান্তই কম। কবি হিসেবে নজরুল রোমান্টিক ছিলেন বলে উপন্যাসের গদ্যভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অলংকার প্রয়োগের প্রাবল্য চোখে পড়ে। এই বৈশিষ্ট্য নজরুলের সাহিত্যকে এক অনন্য ও বিশিষ্ট পর্যায়ে উন্নীত করেছে। তাই নজরুলের উপন্যাসের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য। অলংকারের অনায়াস ব্যবহার তাঁর উপন্যাসের ভাষাকে যেমন ঔজ্জ্বল্য প্রদান করেছে তেমনি করেছে স্বতন্ত্র। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নজরুলে খ্যাতি বিস্তৃত। নজরুলের জন্য বিশ্বময় আজ যে পিপাসা আমরা দেখছি, দেখে প্রতিনিয়ত হচ্ছি আলোড়িত, গর্বিত। নজরুলের বিশ্ববীক্ষার অন্তরে নিহিত যে সর্বজনীনতা সেজন্যই তিনি দৈশিক হয়েও বিশ্ব নাগরিক [৮]। তাই নজরুলের উপন্যাসের ঐতিহাসিক মূল্যের পাশাপাশি এর সাহিত্যিক মূল্যও উচ্চতর। এছাড়াও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্মের প্রেরণা হিসেবে নজরুলের সাহিত্যকৃতির পরিচয় এবং গবেষণার বিকল্প নেই। আর সেকারণেই নজরুলের বিপুল সাহিত্য সম্ভার থেকে শুধু তাঁর একটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী বিশ্লেষণ গবেষণার বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে। তাই নজরুলের *বাঁধন-হারা* (১৯২৭) উপন্যাসের বহুমাত্রিক মূল্যায়ন ও স্বতন্ত্র রচনাশৈলী বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা

আমরা বর্তমান গবেষণাকর্মে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম থেকে নির্বাচিত একটি উপন্যাস বিশ্লেষণকে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র করে নিয়েছি। একজন গবেষক যে ধরণের কাজই করুক তাকে অবশ্যই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। আমাদের গবেষণা সাহিত্য নির্ভর। লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে নির্বাচিত টেক্সট থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয় [৯]। সামাজিক গবেষণায় সাধারণত দুই ধরনের পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত : গুণগত ও পরিমাণগত। গুণগত পদ্ধতি : অনুসন্ধানের বিষয় ও সীমার মধ্যে যা পর্যবেক্ষণযোগ্য তাকেই বিবেচনাযোগ্য উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করা । পরিমাণগত পদ্ধতি : উপকরণ ও যথাযথ সংখ্যাতাত্ত্বিক (পরিসংখ্যাগত) বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রাকতত্ত্ব পরীক্ষার পথ অনুসরণ। উল্লেখযোগ্য যে, গবেষণা পদ্ধতি দুটি ভিন্ন তত্ত্ব বা Paradigm-এর প্রতিনিধিত্ব করে। বর্তমান গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সামাজিক সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্মটি নিজেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস। কাজেই বর্তমান গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে আমরা নজরুলের একটি উপন্যাসের মূল টেক্সট (*বাঁধন-হারা*) গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কিছু নির্বাচিত পাঠকের (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী) সাক্ষাৎকার গ্রহণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যও কাজে লাগানো হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে নজরুলের কথাসাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে (তথ্যনির্দেশ তালিকা)। অবশেষে প্রাপ্ত তথ্য ও উপকরণ শ্রেণিকরণ, বিচার-বিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব-ভাবনার আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কেননা গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভেতর দিয়েই প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে তথ্যসমূহের শ্রেণিকরণের কাজটি পূর্বে করতে হবে। অবশেষে গবেষণালব্ধ নবতর পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। উপন্যাসের টেক্সট বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাহিনী বা বিষয়বস্তুর বর্ণনা প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিশ্লেষণ, উপন্যাসের আঙ্গিক পর্যালোচনা, প্রয়োজনে কখনো পাঠের সারাংশ, গদ্যাংশের উদ্ধৃতি, শব্দ ব্যবহার, অলংকারের প্রয়োগ, রচনারীতি, ভাষাগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে মৌলিকত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বর্ণনামূলক পদ্ধতি ও গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ক্ষেত্র ও পরিধি বিবেচনায় নজরুলের সবগুলো উপন্যাস নিয়ে কাজ করলে বিষয়টি আরো অধিক ফলপ্রসূ ও গ্রহণযোগ্য হতো। তবে গবেষণা প্রবন্ধ রচনার সীমাবদ্ধ পরিসর বিবেচনা করে একটি উপন্যাসকে নির্বাচন করা হয়েছে। এতে করে ভবিষ্যতে গবেষকবৃন্দের জন্য উন্মুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে আশা করা যায়।

প্রাক-নজরুল বাংলা উপন্যাস সাহিত্য

উপন্যাস হল দেশ-কাল-সমাজে-সভ্যতা ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের বাস্তব সত্য চিত্র। বিশেষ করে 'গ্রন্থাকারের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্ম রূপায়িত হয়, তাহাকে উপন্যাস কহে' [১০]। উপন্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সৃষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীতে মীর মশাররফ হোসেনকে আধুনিক গদ্য ও উপন্যাস রচনায় প্রথম মুসলিম লেখক হিসেবে ধরা হয়। তারপর মোজাম্মেল হক উপন্যাস রচনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা উপন্যাস বৈচিত্র্য লাভ করে। ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বাংলা উপন্যাসের এ পথ ধরেই কাজী নজরুল ইসলাম আবির্ভূত হন। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রথম প্রবেশ গদ্যের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ "*ব্যাথার দান*"

[১১]। কিন্তু ঔপন্যাসিক নজরুলের পরিচয় তাঁর কবি সত্তার পেছনে উপেক্ষিত। ১৯২৭ সালে রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পত্রোপোন্যাস *বাঁধন-হারা*। নজরুল চরিত্রের রোমান্টিকতা, স্বাদেশিকতা ও মানবতাবোধের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর উপন্যাসে। বর্তমানেও জনপ্রিয় কবি নজরুলের উপন্যাস বহুলপঠিত। কারণ তাঁর উপন্যাসের ব্যতিক্রমী বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর অভিনবত্ব। রোমান্টিক আবেগ-অনুভুতির পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমাজবাদী তত্ত্বসমৃদ্ধ মানসিকতার প্রয়োগ নজরুল সাহিত্যকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করেছে। দেশপ্রেম, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ, লোকসংস্কৃতির ব্যবহার, পৌরাণিক অনুষঙ্গ, সাম্যবাদী দর্শন, মানবিকতা, সমাজবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্ক্সের মতবাদে বিশ্বাস, অসাম্প্রদায়িকতা তাঁর সাহিত্যকর্মকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে গেছে।

নজরুলের উপন্যাসগুলোকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন শ্রেণির রীতি পদ্ধতি পাওয়া যায়। *বাধঁন-হারা* চিঠির আকারে রচিত পত্রোপন্যাস। অষ্টাদশ শতকে এই আঙ্গিক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উপন্যাসের চরিত্রাবলির লিখিত পত্রের সাহায্যে যখন আখ্যানবস্তুর বিস্তৃতি সাধন করা হয়, তখন তাকে পত্রোপন্যাস বলা হয়। পত্রাকারে উপন্যাসের নানা ঘটনা ও তথ্য পরিবেশিত হয় পত্রোপন্যাসে। পত্রোপন্যাসকে বিশেষ ধরনের উপন্যাস না বলে বিশেষ উপস্থাপন-রীতির উপন্যাস বলা যায়। পত্রাকারে যখন উপন্যাসের নানা ঘটনা ও তথ্য পরিবেশিত হয়, উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র যখন পত্র লিখনের ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত হয় এবং আখ্যানভাগের বিস্তার ঘটে চরিত্রাবলির লিখিত পত্রের মাধ্যমে, তখন সে উপন্যাসকে বলা হয় পত্রোপন্যাস [১২]। এ ধরনের উপন্যাসে চরিত্ররা নিজ নিজ পত্রের ভেতর দিয়ে তাদের আবেগ-অনুভূতি, অভিজ্ঞতা-বোধের কথা বলে। এ জন্য এ জাতীয় উপন্যাসে চরিত্রের যাবতীয় চিন্তা ও অনুভবের সাথে পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে থাকে। পত্রোপন্যাসে চরিত্রাঙ্কনই মূখ্য বিষয় এবং এখানে লেখকের স্বতন্ত্র ভূমিকাটি তেমন জোরদার নয়। এ ধরনের উপন্যাস ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত নয়। *বাঁধন-হারা* পত্রোপন্যাসের পূর্বে নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বসন্তকুমারের পত্র* (১৮৮২) ও আম্বিকাচরণ গুপ্তের *'পুরানো কাগজ'* (১৮৯৯)-এ দু'খানি পত্রোপন্যাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় [২৪]। এছাড়াও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *ক্রৌঞ্চমিথুন*, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) *কষ্টিপাথর*, নিমাই ভট্টাচার্যের *মেমসাহেব* নামে পত্রোপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো নজরুলের তুলনায় অপরিণত চিন্তার ফসল। উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাসেও দেখা যায়।

নজরুলের *বাঁধন-হারা* উপন্যাস পর্যালোচনা

কাজী নজরুলের ইসলাম করাচি সেনানিবাসে থাকাকালীন সময়ে *বাঁধন-হারা* (১৯২৭) উপন্যাসটি রচনা করেন। *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় ১৯২১ সালের ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৭ সালে জুন মাসে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় [১৩]। ১৩২৭ সালের বৈশাখে কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় *মোসলেম ভারত* প্রকাশিত হয়, তার প্রথম সংখ্যা থেকে নজরুলের *বাঁধন-হারা* নামক পত্রোপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে [১৪]। মোট আঠারোটি পত্র ও দশটি চরিত্র উপন্যাসে আছে। নূরুল হুদা, রবিয়ল, মনুয়র, রাবেয়া, সোফিয়া, মাহবুবা, সাহসিকা, রোকেয়া, খুকী, আয়েশা- এ উপন্যাসের চরিত্র। আঠারোটি পত্রে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা সংসারের বিচিত্র-কাহিনি এবং এতগুলো চরিত্রের মনে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দ্বার উদঘাটিত হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি অসাধারণ নৈপূণ্যের বিষয়। উপন্যাসের অবয়ব সংগঠন এবং চরিত্র-চিত্রণে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

নজরুল তাঁর কৈশোর ও সৈনিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পাশাপাশি এ উপন্যাসে শ্বাশত বাঙালি নারী জীবন এবং সমকালীন সমাজের নানাবিধ চিত্র বর্ণনা করেছেন। *বাঁধন-হারা* (১৯২৭) উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে দুটি মুসলিম পরিবার ও তাদের আত্মীয় নূরুল হুদা নামে এক যুবকের জীবনকে কেন্দ্র করে। রবিয়লের মা রোকেয়ার সন্তানতুল্য স্নেহ, ভাবী রাবেয়ার স্নেহে নূরুল হুদা তাদের পরিবারের অত্যন্ত আপনজন হয়ে যায়। রবিয়লদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আয়েশা তার মেয়ে মাহবুবাকে নিয়ে মাহবুবাদের পরিবারে থাকেন। রবিয়লের ছোট বোন সুফিয়া নূরুল হুদার প্রতি এক সময় দুর্বল হয়ে পড়লে ও নুরুলহুদা ভালোবাসে মাহবুবাকে। নুরুলহুদা ও মাহবুবার বিষয়টি সবাই জানতে পারলে দুজনের বিয়ে দেয়ার আয়োজন করা হয়। এমনি অবস্থায় একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে নুরুল হুদা যুদ্ধে চলে যায়। এতে আয়েশা ও মাহবুবা যেমন দুঃখ পান তেমনি কিছুটা অপমানিত বোধ করেন। আয়েশা তার মেয়ে মাহবুবাকে নিয়ে তার মামার বাড়ি চলে যান এবং এক সময় এক বয়স্ক ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গে মাহবুবার বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের অল্প কিছু দিন পরেই মাহবুবার স্বামী মারা যান। বিধবা মাহবুবা স্বামীর অগাধ ধন সম্পত্তি নিয়ে বাকী জীবনটা পূণ্যভূমি মক্কা-মদিনা কাটাবে বলে ঠিক করে। এই হলো *বাঁধন-হারা* উপন্যাসের কাহিনি। এই সাধারণ পারিবারিক কাহিনিটি মোট আঠারোটি পত্রের উত্তর প্রতি উত্তরের মাধ্যমে বিন্যাস করা হয়েছে। পত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলোর অন্তর্বেদনা, উচ্ছ্বাস, আবেগ ও অনুভূতি অনুপম গদ্যে প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসের প্রথম চিঠি নূরুল লিখেছেন রবিয়লকে উদ্দেশ্য করে করাচি সেনানিবাস থেকে (২০ জানুয়ারি, সন্ধ্যা)। চিঠিতে মনের রাগ, অভিমান, অনুরাগের কথা ব্যক্ত হয়েছে। রবিয়লকে লেখা চিঠিতে তাই তিনি বলেছেন, 'আচ্ছা ভাই, যে শুক্তি আর কিচ্ছু চায়না, কেবল ছোট্ট একটি মুক্ত হৃদয়ের গোপন কোণে লুকিয়ে থুয়ে অবতল সমুদ্রের তলে নিজেকে তলিয়ে দিতে চায়' [১৫]

দ্বিতীয় পত্রটিও করাচি সেনানিবাস থেকে মনূয়রকে লেখা হয় (২১ জানুয়ারি, প্রভাত)। এই পত্রের মাধ্যমে নূরুল ফেলে আসা সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। করাচিতে যাওয়ার আগে নূরুলের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু নূরুল বিয়ের দিন পালিয়ে যায় করাচির সৈন্য দলে। তৃতীয় পত্রটি রবিয়ল, নূরুল হুদার পাঠানো চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন (২৯ জানুয়ারি, সালার, প্রভাত-চায়ের টেবিল সম্মুখে)। এই পত্রে রবিয়ল একটি তত্ত্বের উল্লেখ করে ব্যস্ত জীবনের কথাই তুলে ধরেছেন।

"মানুষ যতদিন বিয়ে না করে ততদিন তার থাকে দুটি পা। সে তখন স্বচ্ছন্দে যে কোন দ্বিপদ প্রাণীর মতো হেঁটে বেড়াতে পারে, মুক্ত আকাশের মুক্ত পাখির মতো স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াতেও পারে; কিন্তু যেই সে বিয়ে করলে, অমনি হয়ে গেল তার দু-জোড়া বা এক গণ্ডা পা"([১৬]। চতুর্থ পত্রটি লিখেছেন অভিমানী নূরুল হুদার মা তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে। যদিও তিনি নূরুল হুদার মা নন, তবুও তাঁকে পুত্র স্নেহে প্রতিপালন করেছিলেন। অনেকদিন মায়ের কোনো খবর রাখে না নূরুল, তাই অভিমানী মায়ের এই পত্র। পঞ্চম পত্রটি মনূয়র, নূরুলকে লিখেছেন (বাকুড়া, ২৬-এ জানুয়ারি, বিকালবেলা)। করাচির সাগর সৈকত তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা এখানে খুবই সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে আছে সেটি হলো সোফিয়ার সঙ্গে মনূয়রের বিবাহ। ষষ্ঠ পত্রটি রবিয়লের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন (৬ ফাল্গুন, মুর্শিদাবাদের সালার থেকে) লিখেছেন। সপ্তম চিঠিতে মামার বাড়িতে মাহবুবার অবস্থান সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানা যায়। অষ্টম চিঠিটি লিখেছেন মাহবুবা সোফিয়াকে (১২ই ফাল্গুন, সালার)। উক্ত চিঠিতে মাহবুবা ও সোফিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্কের স্মৃতিচারণ ভাষ্য হয়ে ওঠেছে। নবম পত্রটি ভাবি সাহেবা রাবেয়াকে লিখেছেন নূরুল (করাচি সেনা-নিবাস, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, দুপুর)। নিজের সম্পর্কে নুরুল হুদা লিখেছে-

"মানুষকে আঘাত করে, হত্যা করেই আমার আনন্দ। আমার এই নিষ্ঠুর পাশবিক দুষমনী মানুষের উপর নয়, মানুষের স্রষ্টার উপর। এই সৃষ্টিকর্তা যিনিই হন, তাঁকে আমি কখনই ক্ষমা করতে পারবোনা-পারবোনা" [১৭]।

দশম চিঠিতে মনূয়র, নূরুলকে অভিযোগ করেছে (বাঁকুড়া, ২রা ফেব্রুয়ারি, নিশুত রাত্তির)। একাদশ পত্রে করাচি সেনানিবাসে একটি সুন্দর বর্ণনা করে মনূয়রকে লিখেছেন নূরুল (করাচি সেনা-নিবাস, শ্রীঘর, ১৭ই ফেব্রুয়ারি)। দ্বাদশ পত্রে মাহবুবাকে লেখা রাবেয়ার প্রথম পত্র (সালার, ১২ই ফাল্গুন)। ত্রয়োদশ পত্রে সোফিয়ার সঙ্গে মনূয়রের বিয়ে ঠিক হয়েছে (সালার, ১৩ই ফাল্গুন)। পঞ্চদশ চিঠি রাবেয়া লিখেছেন সাহসিকাকে উদ্দেশ্য করে (সালার, ২৭শে চৈত্র, রাত্তির)। সপ্তদশ পত্রে মাহবুবা সাহসিকাকে লিখেছেন (শেঙান, ১লা আষাঢ়, দুপুর রাত্তির)। অষ্টাদশ চিঠি বা উপন্যাসের শেষ চিঠি নূরুল, সাহসিকাকে পাঠায় (বোগদাদ, ২৩ শে চৈত্র) এই চিঠি পাঠ করার পরেই বোঝা যায় নূরুলকে শুধু মাত্র মাহবুবা ভালোবাসেনি সোফিয়াও ভালোবেসেছিল। মাহবুবা ও সোফিয়া নূরুল হুদার জীবনে চলার পথে সঙ্গী হওয়ার চেয়ে বরং নূরুল হুদার হৃদয়ে তাদের স্থান যথার্থ দখল করে নিয়েছেন। তাই বলা যায় উক্ত উপন্যাসে নূরুল হুদা প্রকৃত পক্ষে *বাঁধন-হারা*। উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদা ছন্নছাড়া, গৃহহীন। বাইরে আনন্দ মুখর, অস্থির হলেও ভেতরে ঠিক তার উল্টো। সে আত্মসচেতন, মুক্তিপাগল যুবক। তাই পরিবার নামক সংকীর্ণ স্নেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে দেশ নামক বৃহত্তর স্নেহের ডাকে সে যুদ্ধে গমন করে। নূরুল হুদার অন্তরালে নজরুল যেন অজ্ঞাতসারে নিজের ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন আর হতাশাকেই প্রকাশ করেছেন এই উপন্যাসে। নূরুল হুদা যতই বলুক 'আমার পথ চলাতেই আনন্দ' কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে যে বেদনা রয়েছে তা সে বুঝতে পেরেছিল। 'স্বেচ্ছাচারী' নূরুল হুদার অন্তর্বয়নে ঋদ্ধ *বাঁধন-হারায়* নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যায় স্বকীয় সত্তার নানা আঙ্গিকে [১৮]। নূরুল হুদার বাঁধনহারা জীবনের প্রসঙ্গে ১৬নং পত্রে সাহসিকা রাবেয়ার কাছে লিখেছে- সে তো আজকের গৃহ-হারা নয়রে রেবা, সে যে চির উদাসী, চির বৈরাগী! সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধলো না। ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণের মতো চমকে উঠে।..এরা বারে বারে কাঁদন নিয়ে আসছে, আবার বারে বারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে।' [১৯]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম নারী সমাজের জীবন ধারার পরিচয় পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। সমাজ সচেতন নজরুলের দৃষ্টিতে কেবল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ধরা পড়েনি সেই সঙ্গে ধরা পড়েছে অসহায় নারীদের বিয়ের নামে বলী দেয়া, কামাতুর বিত্তশালী বৃদ্ধের হাতে তুলে দেয়ার চিত্র। নজরুলের এ উপন্যাসে নারী চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাহসিকা চরিত্রটি। ব্রাহ্মণ সমাজের সুশিক্ষিত সংস্কারমুক্ত মেয়ে সাহসিকা। বাঙ্গালি মুসলমান নারী এবং হিন্দু নারীদের মধ্যে যে কুসংস্কার; ধর্ম বিদ্বেষ ছিল ব্রাহ্মণ সাহসিকার মধ্যে তা ছিল না। সাহসিকাকে লেখা ১৭ নং পত্রে মাহবুবা লিখেছে- "আমার স্বামী আমার রূপকে চেয়েছিলেন রূপার দরে যাচাই করতে। শুনে খুশি হবে যে এ সওদায় তিনি ঠকেননি। কিন্তু এর জন্য স্বামীকে খোঁচা দিয়ে লাভ নেই। এইতো আমার বাংলার অনন্ত শরীফ মুসলমান মেয়েদের চিরকেলে একঘেয়ে কাহিনী" [২০]।

মাহবুবা এর জন্য দায়ী করেছে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থাকে। মাহবুবার চিঠিতে যে ব্যথিত নারী হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন বহ্নিশিখার প্রকাশ ঘটেছে তার মধ্য দিয়ে আসলে তৎকালীন বাংলার গণ্ডিতে আবদ্ধ নারী হৃদয়ের দুঃখ বেদনার চিত্রই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখ ফুটে হৃদয়ের কথা বলতে যে নারীরা লজ্জা পেত সে রকম লজ্জাবতী নারীর পরিচয় পাই সোফিয়া চরিত্রে। নজরুলের এ উপন্যাসে নারী চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাহসিকা চরিত্রটি। ব্রাহ্মণ সমাজের সুশিক্ষিত সংস্কারমুক্ত নারী সাহসিকা। বাঙালি মুসলমান নারী এবং হিন্দু নারীদের মধ্যে যে কুসংস্কার. ধর্ম বিদ্বেষ ছিল ব্রাহ্মণ সাহসিকার মধ্যে তা ছিল না। উপন্যাসের মাহবুবা, সোফিয়া, রাবেয়া, রোকেয়া, ইত্যাদি নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যেমন

উপেক্ষিতা, বঞ্চিতা, স্নেহময়ী নারীর চিত্র তুলে ধরেছেন তেমনি সাহসিকার মধ্য দিয়ে অধিকার সচেতন আন্দোলনকামী নারীর চিত্রও তুলে ধরেছেন। তাই সমকালীন সমাজ সচেতন বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নজরুল ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিতে *বাঁধন-হারা* উপন্যাসটিতে নারীর এক মর্যাদাময় স্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী চরিত্রগুলো নিজেদের অধিকার রক্ষার বশেই পাঠকের মনে স্থান লাভ করেছে। এখানেই কাজী নজরুল ইসলামের কৃতিত্ব। রক্ষণশীল, পর্দানশীল, মহিলাকে ব্যক্তিত্বময়ী নারীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনকি সাহসিকা বোসের মতো হিন্দু রক্ষণশীল নারীর মর্যাদা ও চরিত্রাঙ্কনে নজরুলের পূর্ববর্তী কোনো কথা সাহিত্যিক জাতপাতের উর্ধ্বে গিয়ে হিন্দু নারীকে দেখাতে পারেননি। তাই নজরুলের আর্বিভাব কারোর কাছে দ্রোহীর মতো, কারোর কাছে ঝড়ের মতো, কারোর কাছে ধূমকেতুর মতো [২১]। এছাড়া তিনি এই উপন্যাসে ভাষাগত বিষয়টি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন।

রচনাশৈলীর বিশিষ্টতা

নজরুল একাধারে বহুভাষাবিদ এবং গবেষক। ছোটবেলা থেকেই তিনি ভাষিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। লেটোর দলে গান ও পালা রচনার জন্য তাঁকে বিভিন্ন ভাষার পাঠ নিতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সময় পণ্ডিতের মতো একদিকে সংস্কৃত ছন্দ অধ্যয়ন করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি আরবি-ফারসি, উর্দু, হিন্দি ভাষা থেকেও প্রচুর শব্দ চয়ন করে বাংলা কাব্য ও সাহিত্যকে মুসলিম ঢঙে সাজাবার প্রয়াস করেছিলেন। এমন করে সমস্ত সত্তার শিকড়সহ শুদ্ধ নাড়া দিতে কেউ পারে নি এর আগে। শব্দ ব্যবহাওে আরবি, র্ফাসি ও ইংরেজী শব্দের পাশাপাশি অনায়াসেই তিনি ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক শব্দ [২২]। এভাবে নজরুল বিদেশি শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। যে সাহিত্যিক অন্য ভাষার শব্দ চয়ন করে ভাষার মধ্যে মিলিয়ে দিতে পারবেন তিনি তত বড় শক্তিশালী সাহিত্যিক। নজরুল যত্রতত্র আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দ প্রয়োগ করেননি। ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ক কবিতা, গান ও গদ্যরচনায় সচেতনভাবে হিন্দু ও মুসলিম শাস্ত্র-সংস্কৃতির আচার-আচরণের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ সব শব্দ ব্যবহৃত। তিনি জানতেন ভাষা শব্দ অর্জনে সমৃদ্ধ হয়, বর্জনে নয় [২৩]। শৈশবে নজরুল মক্তবে এবং চাচার কাছে লেখাপড়া শিখেছেন। তিনি একাধারে কবি, লোকগীতিকার, ফারসি ভাষার অধিকারী ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি আরবি-ফারসি শব্দ কৌশলে প্রয়োগ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকেই ফার্সি-উর্দু চর্চার প্রবাহ বিরাজমান ছিল। পরবর্তীকালে ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদ, শওকত ওসমান প্রমুখ সাহিত্যে ইসলামী ভাব আনার জন্য আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তবে সকলের থেকে নজরুলের শব্দ ব্যবহার স্বতন্ত্র। নজরুলের ব্যবহৃত শব্দের অধিকাংশই এখন বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। নজরুল বহু শব্দ লাভ করেছেন লোক-ঐতিহ্যের সঞ্চয় থেকে। ব্যবহার করেছেন পারিবারিক ও সমাজ সূত্রে, আহরণ করেছেন তাঁর স্বল্পকালীন ফৌজি-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে [২৪]।

বাঁধন-হারা উপন্যাসে শব্দ ব্যবহারে নজরুল তাঁর সমকালীন লেখকদের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। অনায়াসে ব্যবহার করেছেন বিদেশি বিভিন্ন ধরনের আরবি, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি শব্দ। তবে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম পরিলক্ষিত হয়। নজরুলের কাব্যভাষা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার স্রষ্টা বহুভাষাবিদ ড. সৈয়দ মুজতবা আলী নজরুল রচনাবলীতে ইরান তুরানের স্বপ্নভূমি প্রসঙ্গ তুলে একবার বলেছিলেন: ‘পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রিয় নজরুল নিজের জন্য আরও একটি কাব্যজগৎ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছিলেন। সে জগৎ আরব-ইরান-সংস্কৃতি কেন্দ্রিক জগৎ।’ আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নজরুল সচেতনভাবে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন [২৫]। *বাঁধন-হারা* উপন্যাসে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি ভাষার শব্দ, বাক্য, প্রবাদের প্রয়োগ বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এসকল শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নজরুল নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন নিজস্ব গদ্যভাষা। যেমন : কৈফিয়ত, বিলকুল, নারাজ, মুলতুবি, তবিয়তে, খোদা, হামার, বেহেশত, ফেরেশতা, মুনাজাত, মজলিস,নামাজ, সেজদা, দুশমন, নওয়াবজাদা, হালাক, বেহুদা, নেকা, বুনিয়াদি খান্দান, সহি-সালামত, হামারা আপনা ঘর, সজন সজন মিল গিয়া, ঝুট পড়ে বারিয়াত! বেয়নেট, নো প্যারেড, ফুল-স্টপ, ফুল-ফোর্স, স্টক, এক্সচেঞ্জ, রাবিশ, আর্মিসটিস ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে ভাষায় নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন [২৬]।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও দ্বিত্ব শব্দ ব্যবহার বাংলাভাষার একটি বিশেষ ঐতিহ্য যা বিশেষত্ব লাভ করেছে নজরুলের গদ্যে কখনো অনুপ্রাস বা অলঙ্কার রূপে কখনও সাধারণ ব্যবহারে। যেমন- কুটিকুটি, খনখনে, থৈ থৈ, ঘুনঘুনে, ফিন ফিন, কশ-কশে, চমকে চমকে, রুনু-ঝুনু, ছটফটানি, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, ফোঁৎ ফোঁৎ, হেলফেলিয়ে, মিউ মিউ, ঘাঁটাঘাঁটি, খামচা-খামচি, চুলোচুলি [২৭]। এছাড়াও বেশ কিছু দেশি বা আঞ্চলিক শব্দও তিনি ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে। স্থানীয় বা লোকজ শব্দের ব্যবহার, গদ্যে পূর্ববঙ্গীয় শব্দরূপ প্রচুর দেখা যায়। যেমন- ন্যাংটা, ধিঙ্গী, চ্যাংড়া, ঢোল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এ উপন্যাসের ভাষা বাঙালির ব্যবহৃত আটপৌঢ়ে ভাষায় পরিণত হয়েছে। রচনারীতি নজরুল গদ্যের সাধারণ নিয়ম বা ক্রম সবসময় মানেননি, তিনি তার রচনায় পূরানো, অন্ত্যজ, অকুলীন, অসংস্কৃত ও শ্রেণীশাসিত শব্দ ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হননি [২৮]। বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। *বাঁধন-হারা* উপন্যাসে জীবন সম্পর্কে নজরুলের দর্শন উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদাকে প্রভাবিত করেছে। যেমন-“যদি দুঃখ না পাওয়া গেল জীবনে, তবে সে জীবন যে বে-নিমক, বিস্বাদ! এই বেদনার

আনন্দই আমাকে পাগল করলে, ঘরের বাহির করলে, বন্ধন-মুক্ত রিক্ত করে ছাড়লে; আর আজো সে ছুটেছে আমার পিছু পিছু উল্কার মতো উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে! দুঃখও আমায় ছাড়বেনা, আমিও তাকে ছাড়বোনা।" [২৯]

দেশপ্রেম ও সমাজচিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন- 'এই 'ছুৎমার্গ' দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বের-করতে আমাদের হিন্দু মা- বোনদেরই চেষ্টা করতে হবে বেশি। কেননা পুরুষদের চেয়ে এঁদেরই এ বদ- রোগটা ভয়ানক মজ্জাগত।' [৩০]

গদ্যভাষা নির্মাণে অলঙ্কারের বিকল্প নেই। অলঙ্কার হচ্ছে সাহিত্যের সেই সমস্ত 'ভাষাগুণ' যার দ্বারা সাহিত্যের উৎকর্ষ সৌন্দর্য সৃষ্টি বা কাব্যকে সজ্জিত করা হয় [৩১]। নজরুল ইসলাম কবি বলেই এ উপন্যাসে তিনি উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক,যমক, অনুপ্রাস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবহার করতে পেরেছেন। উপন্যাসের প্রথম পত্রে নূরুল হুদাকে দেখা যায় প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের এক অনবদ্য সুন্দর উপমা দিতে। যেমন- 'তোর উপরটা লোহার মত হলেও ভিতরটা ফুলের চেয়ে নরম! তুই বাস্তবিকই শুক্তি, উপরটা ঝিনুকের শক্ত খোসায় ঢাকা আর ভেতরে মানিক' [৩২]। উপন্যাসের ভাষায় অনুপ্রাসের প্রয়োগেও নজরুল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন: যেমন-'বোধ হয় আবার ঝর ঝর করেই জল ঝরবে।' 'মেয়ে মানুষ সব যেনো কলের জল বা জলের কল/ একবার খুলে দিলেই হল।' 'আমি ত হদ্দ হলাম বলে বলে।' 'আমার ইচ্ছে হয়, এই মেয়েগুলোকে গরুখেদা করে খেদিয়ে তেপান্তরের মাঠে ঠেলে উঠাই গিয়ে।' 'আমাদের পোড়া কপালের সমবেদনায় পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বা উনুনে কাঁচা কাঠ দিয়ে অঝোর নয়নে কাঁদেন!' 'আমার স্বামী রূপকে চেয়ে ছিলেন রূপার দরে যাচাই করতে।' 'হায় রে শ্বেতবসনা সুন্দরী, তোর বসন্ত বৃথাই গেল।' [৩৩]

এমনিভাবে উপমা, উৎপ্রেক্ষাসহ অসংখ্য অলংঙ্কার বহুল বাক্য প্রয়োগের ফলে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস কাব্যমাধুর্য্যে হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাধর্মী। ভাষাকে স্বাভাবিক সাবলিল করার প্রয়োজনে এ উপন্যাসে নজরুল চরিত্রানুযায়ী যেমন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তেমনি অনেক আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচন প্রয়োগ করেছেন। নজরুলের অধিকাংশ প্রবাদ আটপৌঢ়ে ও পরিচিত পরিবেশের রচনা। প্রায় হাজারখানেক প্রবাদ নজরুল সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসেই বিচিত্র রকম প্রচুর প্রবাদ বিদ্যমান। নিম্নে কয়েকটি প্রবাদ প্রবচনের উদাহরণ দেয়া হলো: ' ইল্লৎ যায় ধুলে, আর খসলৎ যায় মলে'এই ডাক-পুরুষে কথাটি খাঁটি সাচ্চা বাত' ' যেমন অন্‌হেলা, তেমনি মজা! এখন মতির মালা বানরে নিয়ে গেল! কথায় বলে, -কপালে নেই ঘি, ঠক-ঠকালে হবে কি?' ' তুই নিজের চরকায় তেল দে! 'যার বিয়ে তার ধুম নেই, পাড়া-পড়শির ঘুম নেই!' ' তুমি যে এমন করে মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারবে, তা জানতাম না' ' খাবিত খৈ খা, না খাবি ত খৈ খা!' ' সোনার পাথর বাটি' বা 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' ' গোদের উপর বিষফোঁড়া' 'এক মাঘে শীত পালায় না!' 'বাঁজায় জানে ছেলের বেদন!', 'এ গরিবের কথা বাসি হলেও ফ'লবেই ফ'লবে!' 'অজবুড়ি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!' ' কথায় বলে-' চোখ মুদলে কেবা কার।' 'নসিবের উপর চারা নাই।' তা নিয়ে অনুতাপ করেও কোন ফল হবে না' 'মা মরে মাসি ঝরে' কথাটা একদম ভুয়ো বলে মনে হয়' 'চুরি কে চুরি উল্টো সিনাজুরী!, 'ধান-ভানতে শিবের গীত', খসলৎ যায় মলে। 'আপন ভিটেয় কুকুর রাজা' 'আকাশে সরষে ফোটে, গোদা ঠ্যাং লাফিয়ে ওঠে!' '-ঐ যে কি বলে- আমি হচ্ছি ' সাহেবের দাগা পাঁঠা' [৩৪]

আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগেও নজরুল বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রানুযায়ী ভাষা প্রয়োগ নজরুলের গদ্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন- পরশ্রীকাতর এক বন্ধুর মন্তব্য: ' আরে মিঞা হঃ! আমি না কইছিলাম যে, এইসব কাগজ লইতামনা। এই সব ফাজিল চ্যাংরারা যাহাতে ল্যাহে, হেই কাগজ না আবার মানুষে পড়ে? আমার চারড্যা ট্যাহা না এক্কেবারে জলে পরলো নি?' [৩৫]। আঞ্চলিক ভাষায় ব্যঙ্গ কবিতাও রচনা করেছেন তিনি: "নেবুর ফুল আর করমচা/লাও এক কাপ গরম চা!" [৩৬]

বাঁধন-হারা উপন্যাসে পুরাণ প্রসঙ্গে ভিন্নতা

পুরাণের মধ্য দিয়েই একটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের কাঠামোটি নিবিড়ভাবে মিশে থাকে। নজরুলের কবিতা ও গানে যেভাবে পুরাণের ব্যবহার দেখা যায় সে তুলনায় গদ্য সাহিত্যে পুরাণের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম। তবে নজরুলের উপন্যাসসমূহ পুরাণের নানা ভাবনা ও অনুষঙ্গ আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। পুরাণ কাহিনিকে নিজের মত করে পুনঃনির্মাণ- কৌশল তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। *বাঁধন-হারা* উপন্যাসের তৃতীয় চিঠিতে রবিয়ুল নূরুল হুদাকে তুলনা করছে- ' তোরা কল্পনারাজ্যের দেবশিশু, বনের চখা-হরিণ, আর আমরা বাস্তব জগতের রক্ত-মাংসে গড়া মানব, খাঁচার পাখি!' [৩৭]। এ ধরণের অনুষঙ্গ ভাষার শিল্প-সুষমা বৃদ্ধি করেছে। নূরুল হুদাকে অসুরের শক্তি হিসেবে তুলনা করেছেন নজরুল। এভাবে নজরুল পুরাণে অশুভ শক্তিকে শুভরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেদিক থেকে আমরা বলতে পারি উপন্যাসটি মানদণ্ডের বিচারে বিচ্ছিন্ন পুরাণ প্রসঙ্গের আশ্রয়ে একটি গভীর মাত্রা লাভ করেছে [৩৮]। এছাড়াও উপন্যাসের ১১নং পত্রে ভাষা নিমার্ণের কৌশল হিসেবে পৌরাণিক অনুষঙ্গ উপমা ও প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। '.. যেরকম প্রলয় নৃত্য শুরু করে দিয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে মহাদেবও তার ভূত- প্রেত-বলদাদিসহ কৈলাস-হিমালয় ছেড়ে এতক্ষণে তিব্বত পেরিয়ে পড়েছেন' [৩৯]। 'মন্থন শেষে সৃষ্টি আজ নিস্পন্দ-সাড়া শব্দহীন' [৪০]। এছাড়াও রামায়ণ কাহিনীর কীচক বধ, গন্ধ-মাদন পর্বত, গন্ধেশ্বরী প্রসঙ্গ প্রয়োগের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। মনুয়র চরিত্র, নূরুল হুদা চরিত্র বিশ্লেষেণে তিনি পুরাণ প্রসঙ্গ অবতারণা

করেছেন অভিনবরূপে। ঐতিহ্য ও পুরাণের ব্যবহারে হিন্দু পুরাণ-এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- সমুদ্র মন্থন প্রসঙ্গ, বৈকুণ্ঠের ঠাকুর, লক্ষ্মী ঠাকরুণ, দানব-দৈত্যের দল প্রভৃতি প্রসঙ্গ। হাস্যরস নজরুলের উপন্যাসের এক স্বাভাবিক রচনাকৌশল। তিনি পৌরাণিক অনুষঙ্গ নিয়েও হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। নজরুল এভাবে বিভিন্ন পৌরাণিক অনুষঙ্গ প্রয়োগ করে *বাঁধন-হারা* উপন্যাসের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। গদ্য সাহিত্যে নজরুলের পুরাণ মনস্কতা, লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, আচার-উৎসব, ধর্মবিশ্বাসসহ নানাবিধ পুরাণ অনুষঙ্গ লক্ষ্য করা যায় যা বাংলা উপন্যাসে বিরল। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের তুলনায় এখানেই নজরুলের অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার

নজরুল মূলত বিদ্রোহের ভাষা রচনা করেছেন তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলেই থাকে ভাষা-সংযোগ। নজরুলে মধ্যপ্রাচ্যীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আমাদের সাহিত্যকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। নজরুলের উপন্যাসে উর্দু ও ফারসি শব্দের ব্যবহার সমগ্র উপমহাদেশের পাঠককে নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। নজরুল ভারতীয় ঐতিহ্যের শব্দে যত বেশি স্বচ্ছন্দ মধ্যপ্রাচ্যীয় শব্দে তেমন নয়। কেবল ধর্মীয় অনুষঙ্গই নয় মিথ এর আবহ সৃষ্টিতেও নজরুল অনন্য। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের আধুনিকতাবাদ নজরুলকে আংশিক প্রভাবিত করেছিল। কারণ নজরুল সমকালীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য প্রেরণা লাভ করেছেন। তিনি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে অবস্থান করেও শাসকগোষ্ঠীর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে বিদ্রোহের ভাষা নির্মাণ করেছেন। নজরুল আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের অর্জন, আমাদের পথের দিশারী, পাঞ্জেরী। আমরা তাঁকে এবং যে বলয়ে তাঁর অস্তিত্ব ও আবির্ভাব তার চেতনাকেও অন্তরে সঞ্চারিত করি। খুব অল্প সংখ্যক লেখকই তা করেছেন। নিজের দেশ এবং দেশমাতৃকার সেবা, নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন ও বিপ্লব রূপায়ণ করেছেন নিজস্ব স্টাইলের মাধ্যমে। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও নজরুলের এ ধরণের প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত। প্রথাগত মানদণ্ডের বাইরে নজরুলের ব্যক্তিগত স্টাইল ও রীতি অনেকক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে। বিশেষ করে নজরুলের ভাবাবেগের আতিশয্য, রোমান্টিক মনের উচ্ছ্বাস, বাস্তবতার পরিমিতিবোধ প্রভৃতি বিষয়ে অনেকে মন্তব্য করে থাকেন। তিনি পাশ্চাত্যপ্রভাব, তথাকথিত আধুনিকতাবাদ থেকে দূরে সরে স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন। উপনিবেশের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ভাষা নির্মাণ তাঁর বৈশিষ্ট্য। বিষয়বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলীর আলোচনায় তাঁর উপন্যাস পাঠ করলে দেখা যায় তাঁর বিষয়-ভাবনা, প্রেক্ষাপট নির্মাণে তিনি অনেকটা পাশ্চাত্য কাঠামোকে পরিত্যাগ করে বাস্তবতাকে গ্রহণ করে উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামী ভাষা ও কাব্যিক ভাষা নির্মাণ করেছেন। নজরুল একটা বিশেষ পর্বের সংকটাপন্ন সময়কে উপস্থাপনের জন্য নতুন ভাষা ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। পরিচিত পটভূমিকে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। কোথাও কোন তাত্ত্বিক আবহে ভারবাহী নয়, তবে তাঁর নিজস্ব দর্শনে প্রাণবন্ত হয়ে উপস্থাপিত সাহিত্য। ভারতবর্ষের বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসে সফল প্রয়োগ করেছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দলিল নজরুলের উপন্যাস। নজরুল সকল যুগের সকল সময়ের আজ অবধি সমান গুরুত্বপূর্ণ লেখক।

লেখকদের অবদান

গবেষণার ধারণা ও কাঠামো প্রণয়নে উভয় লেখকের সমান অবদান রয়েছে। আতি-উন-নাহার মূল গবেষণা ভাবনা, বিষয় নির্বাচন, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা, বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করেছেন। মোঃ কয়েছ আহমেদ তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা, যুক্তি ও ব্যাখ্যা সমৃদ্ধকরণ, ভাষাগত ও প্রাযুক্তিক পরিমার্জন এবং প্রবন্ধের চূড়ান্ত সম্পাদনা সম্পন্ন করেছেন। প্রবন্ধের চূড়ান্ত সংস্করণ উভয় লেখকই মনোযোগ সহকারে পাঠ ও অনুমোদন করেছেন এবং এর বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের যথার্থতার জন্য তারা যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা কার্য সম্পাদনের সমগ্র প্রক্রিয়ায় যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, যাঁদের একাডেমিক সহায়তা, গবেষণামুখী পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এই গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের সম্মানিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, যাঁরা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিল ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য সরবরাহে আন্তরিক সহায়তা করেছেন। গবেষণা চলাকালে পরিবার, সহকর্মী এবং বন্ধুদের ধৈর্য, অনুপ্রেরণা ও মানসিক সমর্থন আমাদের অগ্রযাত্রায় অবিচল প্রেরণা জুগিয়েছে—যার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি ঋণী। পরিশেষে, কাজী নজরুল ইসলামের অমর সাহিত্যকর্ম ও তাঁর সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এই গবেষণার প্রেরণার মূল উৎস। তাঁর সাহিত্যচর্চা ও সৃষ্টিশীল শক্তি সকল গবেষক, পাঠক এবং সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য অনন্ত অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে—এই বিশ্বাস ব্যক্ত করছি।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব

লেখকগণ ঘোষণা করছেন যে, প্রবন্ধ *"কাজী নজরুল ইসলামের বাঁধন-হারা উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী পর্যালোচনা: একটি ভিন্ন রূপরেখা"* এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ধরনের আর্থিক, পেশাগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব তাদের নেই।

তথ্যনির্দেশ:

১. রশিদ হায়দার (সম্পাদক) (২০১০) *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, ২৭ তম সংকলন, নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকা, পৃ. ৫৮
২. ড. অমৃতলাল বালা (২০০৯) *কাজী নজরুল ইসলাম স্মারকগ্রন্থ*, ১ম প্রকাশ, সাহিত্যবিলাস, পৃ. ২২
৩. ভূঞা, মো. আব্দুর রাজ্জাক (সম্পা.) (২০১৭) *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, ৩৩তম সং, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, পৃ. ৬১
৪. আব্দুল হাই শিকদার (২০১৭) *বিশ্বময় নজরুল*, ২য় সংস্করণ, শোভাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ০৭
৫. আব্দুল কাদির (১৯৮৯) *নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, পৃ. ১২৫
৬. পারভীন আক্তার জেমী (২০১০) *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*, ১ম সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২১
৭. মুজফ্ফর আহমেদ (২০২৪) *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, ১ম প্রকাশ, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১০৯
৮. আব্দুল হাই শিকদার (২০১৭) *বিশ্বময় নজরুল*, ২য় সংস্করণ, শোভাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৫
৯. সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ (১৯৯৯), ড. জয়ন্ত গোস্বামী, পুস্তক বিপনী কলকাতা, পৃ. ০৭
১০. শ্রীশচন্দ্র দাশ (২০১০) *সাহিত্যসন্দর্শন*, পুমু, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা, পৃ. ৮৭
১১. সৈকত আসগর (১৯৯০) *নজরুলের গদ্য রচনা: ভাবলোক ও শিল্পরূপ*, অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ২১
১২. শ্রীশচন্দ্র দাশ (২০১০) *সাহিত্যসন্দর্শন*, পুমু, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা, পৃ. ৯৯
১৩. হোসনে আরা জলী (২০০৯) *নজরুল উপন্যাস: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, পৃ. ৩১
১৪. হোসনে আরা জলী (২০০৯) *নজরুল উপন্যাস: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, পৃ. ৩২
১৫. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-০৬
১৬. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-১৫
১৭. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-৫৪
১৮. রশিদ হায়দার (সম্পা.) (২০১০) *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, ২৭ তম সংকলন, নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকা, পৃ. ৫৮
১৯. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-১০২
২০. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-১১৫
২১. আহমেদ শরীফ (২০২২) *একালে নজরুল*, ২য় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ-৩৩
২২. হোসনে আরা জলী (২০০৯) *নজরুল উপন্যাস: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, পৃ. ৬৬
২৩. সৈকত আসগর (১৯৯০) *নজরুলের গদ্য রচনা: ভাবলোক ও শিল্পরূপ*, অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ১৯৯
২৪. মনিরুজ্জমান (২০২১) *নানা বর্ণে নজরুল*, দি এ্যাড কমিউনিকেশন, চট্টগ্রাম, পৃ. ০৮
২৫. ড. রাজীব হুমায়ুন (২০০৫) *নজরুল ও বিশ্বসংস্কৃতি*, বিশেষ সংস্করণ, সূচীপত্র, ঢাকা, পৃ. ১৫৭
২৬. কাজী নজরুল ইসলাম (২০২৩) *বাঁধন-হারা* , আগামী প্রকাশনী, ঢাকা পৃ. ০৫-১০
২৭. কাজী নজরুল ইসলাম (২০২৩) *বাঁধন-হারা* , আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১১-২০
২৮. সৈকত আসগর (১৯৯০) *নজরুলের গদ্য রচনা: ভাবলোক ও শিল্পরূপ*, অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ১৯৮
২৯. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-৬৮
৩০. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-৭৯
৩১. আবুল ফজল ও রেজাউল ইসলাম (২০১২) *সাহিত্য তত্ত্ব-কথা*, পুমু, দুরন্ত পথিক, ঢাকা, পৃ-১৮৭
৩২. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-১৯
৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-৯৬
৩৪. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-১৮
৩৫. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-২৩
৩৬. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-৭১
৩৭. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-১৬

৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-৫৮
৩৯. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-৭০
৪০. কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫) *নজরুলের উপন্যাস সমগ্র*, ১০ম মুদ্রণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, পৃ-১১৮